বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা
খ- ৩০ বার্ষিক সংখ্যা ১৪১৯

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর

আসজাদুল কিবরিয়া*

১

স্বাধীনতার পর চার দশক পার করেছে বাংলাদেশ। এই চার দশকে ব্যর্থতা যেমন আছে, তেমনি আছে সাফল্য। যেকোনো দেশ বা জাতির এগিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকে সাফল্য-ব্যর্থতার যুগপৎ মিশ্রণ। বাংলাদেশেরও তাই আছে। যদিও আমরা আমাদের সাফল্যের চেয়ে ব্যর্থতার দিকেই আলোকপাত করতে এবং তা নিয়ে হা-হুতোস্মি করতে অনেক বেশি পছন্দ করি। যে অর্জনগুলো আমাদের হওয়া উচিত ছিল বা করা সম্ভব ছিল, সেগুলো না হওয়া বা খ-িতভাবে হওয়ার জন্য এই হতাশাবোধ দেখা দেয়। তবে এই হতাশাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে সাফল্য বা অর্জনগুলো দৃষ্টির অন্ড়রালে থেকে যাওয়ায়। দৃষ্টিভঙ্গিটা এমন যে সাফল্য যা হয়েছে সেগুলো প্রাপ্য ছিল, কাজেই তা নিয়ে অতো বিশেণ্ডষণ-বিবেচনার দরকার নেই। বরং যেখানে সফল হওয়া গেল না, সেখানেই মনোযোগ দিতে হবে আগামীতে সাফল্য আনয়নের জন্য।

বলাই বাহুল্য যে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনের জগতে এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব বহুদূর পর্যন্ড় বিস্ড়ৃত। সংবাদপত্রের কলাম, সাময়িকীতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ আর টেলিভিশনে টকশো পর্যালোচনায় এই প্রভাবের বিষয়টি স্পষ্ট হতে পারে। তবে গভীরতর ও বিস্ড়ৃত বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রতিফলন হিসেবে আমরা যখন বইকে বেছে নেই, তখনো এই প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কিছুটা কঠিন হয় বৈ কি। বইয়ের প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিক্রমা অথবা সমাজ কাঠামো অথবা রাজনৈতিক উত্থান-পতন অথবা অর্থনীতি যেটাই হোক না কেন, তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি বিবেচনায় নিতে হয়।

এই গৌরচন্দ্রিকাটি করতে হলো 'সাহিত্য প্রকাশ' থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর' শীর্ষক বইটি হাতে নিয়ে। দেশের অন্যতম অর্থনীতিবিদ র-শিদান ইসলাম রহমান রচিত এই বইটিকে ঘিরে এই নিবন্ধের যাবতীয় আলোচনা আবর্তিত হবে। র-শিদান ইসলাম রহমান বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর গবেষণা পরিচালক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশেণ্ডষণ, পর্যালোচনা ও গবেষণা করে যাচ্ছেন নিরলসভাবে। তাঁর কাজে অগ্রাধিকারের তালিকায় রয়েছে শ্রম বাজার ও শ্রমিক, গ্রামীণ অর্থনীতি এবং কৃষি ও শিল্পখাত। এসব বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল, বইয়ের অধ্যায় হিসেবে এবং পত্র-পত্রিকায় এসেছে।

'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর' নামের বইটি অর্থনীতি বিষয়ক একটি বই। একে উন্নয়ন বিষয়ক বইও বলা যেতে পারে। আর শিরোনাম থেকেও এটা পরিষ্কার যে, স্বাধীন বাংলাদেশের চার দশকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিক্রমাকে পর্যালোচনা করা হয়েছে এখানে। কাজটি যে শ্রমসাধ্য তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ করে গবেষণানির্ভর কাজের ওপর ভিত্তি করে বইটি রচিত।

---

* বাণিজ্য পাতা সম্পাদক, প্রথম আলো।

সে কারণেই বাংলাদেশের অর্থনীতি বিষয়ে প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে এটি মূল্যবান সংযোজন হিসেবে স্থান করে নেওয়ার দাবি রাখে।

২

মোট ১২টি বৃহত্তর অধ্যায়ে বইটি সাজিয়েছেন রুশিদান ইসলাম রহমান। প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন নিয়ে আলোকপাত করার মধ্য দিয়ে তিনি বইটির সামগ্রিক পটভূমি স্থাপন করেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ধাপে ধাপে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তথ্য-পরিসংখ্যান সহযোগে আলোচনা করেছেন। এতে বাংলাদেশের শিল্পখাত, কৃষিখাত, ক্ষুদ্রঋণ, কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব, দারিদ্র্য, শিক্ষা, আঞ্চলিক বৈষম্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পখাতে নারী শ্রমিক বিষয়ে বিশেণ্ডষণ ও পর্যালোচনা স্থান পেয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে লেখিকা সংক্ষেপে 'উন্নয়ন' ধারণাকে বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন। কিছু বাস্ড়ব দৃষ্টান্ড় তুলে ধরে দেখিয়েছেন উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা। তিনি লিখেছেন: 'এ দেশের মানুষ এটা প্রতিষ্ঠিত করেছে যে তারা উন্নয়ন চায়। আপাতদৃষ্টিতে যাদের মনে হবে প্রান্ড়িক অবস্থানে, ভাগ্যের হাতে সমর্পিত, তাঁরাও যুদ্ধ করছে প্রকৃতির বিরূপতার সাথে, পরিশ্রম করছে পরিবারের সদস্যদের হাতে খাদ্য তুলে দেওয়ার জন্য। যাদের নিত্যসঙ্গী ছিল কুসংস্কার, আধুনিকতার প্রতি ছিল যারা বিরূপ, তাদের মানসিকতায় এসেছে পরিবর্তন। ... শিশুদের টিকা দেয়ার জন্য কিশোরী মা, নিরক্ষর মাতামহীরা ভিড় করে আসছেন, খাবার স্যালাইনে প্রাণ বাঁচাচ্ছেন কত শিশুর, ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পেলে ছুটে যাচ্ছেন আশ্রয়কেন্দ্রে, সেখানেই জন্ম নিচ্ছে নতুন শিশু। শিল্প শ্রমিক ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে যাচ্ছেন কর্মস্থলে।' (পৃ-১৯)। অর্থাৎ উন্নয়নকে বুঝতে হলে যে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের বিভিন্ন দিককে বুঝতে হবে, খুঁটিয়ে দেখতে হবে ছোট ছোট বিভিন্ন অগ্রগতি ও পরিবর্তনকে, সেটাই যেন অল্প কথায় স্পষ্ট করে দিলেন লেখিকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন তথ্য-পরিসংখ্যান সহযোগে। ৪০ বছরের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার, মাথাপিছু আয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিস্থিতি ও মূল্যস্ফীতির প্রবণতা সংক্ষেপে তুলে ধরে কয়েকটি বাস্ড়বসম্মত ঝুঁকি ও আশংকার কথা উলেণ্ডখ করেছেন। যথারীতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রশ্নটি এখানে এসেছে প্রথম ও প্রধান উদ্বেগ বা ঝুঁকি হিসেবে। আসলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার বিষয়টি বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত গন্ড়ব্যে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর শর্ত হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল বহু আগে থেকেই। সময়ের বিবর্তনে এর মাত্রাগত কিছু পরিবর্তন এসেছে মাত্র। এক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি উলেণ্ডখ করা যায়। লেখিকাও এটি উলেণ্ডখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'দুর্নীতিপরায়ণতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ না করলে প্রবৃদ্ধির হার উচ্চতর হতে পারত। এই অঞ্চলের ভারত, শ্রীলঙ্কা এমনকি পাকিস্ড়ানের উচ্চতর মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধির হার এর তুলনা থেকেই তা প্রতীয়মান হয়।' (পৃ-৩৫)। যৌক্তিকভাবেই তিনি এর পাশাপাশি জমির অপ্রতুলতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা উলেণ্ডখ করেছেন। যদিও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশের একটা স্বকীয় সক্ষমতা তৈরি হয়েছে, তবু বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কালো মেঘের বিস্ড়ারে তা নিতান্ড়ই অপ্রতুল বলে প্রতীয়মান হয়।

শেষাংশে এসে এখানে লেখিকা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশে উন্নীত করার বিষয়টি নিয়ে এসেছেন। সম্প্রতিকালে বিভিন্ন মহল থেকে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির একটা তাগিদ তৈরি করা হয়েছে। জনমানসে এটাকে একটা অত্যন্ড় গুর"ত্বপূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা প্রতিফলিত হয়েছে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলে ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার কার্যপত্রে। সামষ্টিক অর্থনীতির সূত্র মেনে এই ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের হার জিডিপির ৩২ শতাংশে যে উন্নীত করতে হবে, সে কথাটিও বরাবরই স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে র"শিদান ইসলামের পর্যবেক্ষণটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বর্তমানের ২৪ শতাংশ বিনিয়োগ হার দ্র"ত ৩০ বা ৩২ শতাংশে উন্নীত করার বাস্ড়বতা নিয়ে কিছুটা সন্দেহ পোষণ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি বরং 'সহযোগিতামূলক রাজনৈতিক-সামাজিক' ধারার দিকে মনোযোগী হতে আগ্রহী। তার যুক্তিটি এরকম যে, সামাজিকভাবে উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন আনা গেলে তার ইতিবাচক প্রভাব প্রবৃদ্ধির হারকে উপরের দিকে তুলতে সহায়তা করবে। তিনি বিনিয়োগ হার বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছেন না, তবে অতিমাত্রায় এদিকে মনোযোগী হতে সম্মত হন। কেননা এজন্য যে পরিমাণ কর্মোদ্যোগ প্রয়োজন, তার কিছুটা যদি সামাজিকখাতে অবিরতভাবে বজায় রাখা যায়, তাহলেও যথেষ্ট ইতিবাচক ফল পাওয়া যাবে। অবশ্য এ নিয়ে বিস্ড়ারিত আলোচনার অবকাশ থাকলেও লেখিকা সেদিকে অগ্রসর হননি। কিন্তু একটি ভিন্ন চিন্ড়ার সূত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন যার ওপর ভিত্তি করে বড় কাজ হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে শিল্পখাতের বিকাশ নিয়ে। যারা সংক্ষেপে বাংলাদেশে শিল্পখাতের বিকাশ সম্পর্কে কিছু মৌলিক ধারণা পেতে চান, তারা এই অধ্যায়টি থেকে উপকৃত হবেন। যথেষ্ট তথ্য-পরিসংখ্যানও ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন র"শিদান যার মধ্য দিয়ে আমাদের শিল্প বিষয়ক নীতির সীমাবদ্ধতাও চিহ্নিত হয়েছে। যেমন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের বা এসএমই-র সংজ্ঞা নির্ধারণ। তিনি দেখিয়েছেন যে একেক সরকারি সংস্থা একেক সংজ্ঞা ব্যবহার করছে। আবার তা পরিবর্তন করছে সমন্বয়হীনভাবে। ফলে এসএমই নিয়ে সম্প্রতিকালে যে হুজুগ তৈরি হয়েছে, তা অনেকক্ষেত্রেই অন্ড়:সারশূন্যতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তবে এই অধ্যায়ে শিল্পনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা বা বিশেণ্ডষণ প্রয়োজন ছিল।

চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে র"শিদান ইসলাম আলোকপাত করেছেন কৃষিখাতের বিভিন্ন দিকের ওপর। তাতে করে বাংলাদেশের কৃষিখাতের বিষয়ে একটা স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে। কিছু বিষয়ে বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন: কৃষি প্রযুক্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে অকৃষিখাত ও গ্রামীণ অর্থনীতি নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন র"শিদান। এই অধ্যায়টি চিত্তাকর্ষক বলা যেতে পারে। বাংলাদেশের ছাঁয়াঢাকা-কুহুডাকা গ্রামের সনাতনী চিত্রটিতে কতোটা বদলে গেছে তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে এই অধ্যায় থেকে। জটিলতাও চিহ্নিত করেছেন অকৃষিখাত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। লিখেছেন: '....অনেক ক্ষেত্রে কৃষি ও কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ পৃথক করা কঠিন। যেমন কেউ গর" পালন করে দুধ বিক্রয় করেন, এটা কৃষি কাজ। কিন্তু তিনি ঘোল বানিয়ে বিক্রি করলে সেটা অকৃষি- এই বিভক্তিকরণ কঠিন। তেমনি কেউ ধান কিনে ভাঙ্গিয়ে চাল খুচরো বিক্রি করলে তার মধ্যে প্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবসা দুটিই থাকছে।'(পৃ-১১৯)। এই অধ্যায়ে ক্ষুদ্রঋণের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। ক্ষুদ্রঋণ নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনা এখন বাংলাদেশে নতুন মাত্রা পেয়েছে। আগামীতেও বিষয়টি আলোচনায় থাকবে। এখানে ক্ষুদ্রঋণের সুদের হার বা সেবামাশুল (সার্ভিস চার্জ)

নিয়ে যে বিশেণ্ডষণটি দেওয়া হয়েছে, তা গুর"ত্বপূর্ণ। এই চার্জের হার নিয়ে বিভিন্ন যুক্তি-পাল্টাযুক্তি পর্যালোচনা করে লেখিকা উপসংহারে পৌঁছেছেন: 'আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সার্ভিস চার্জের হার না বাড়িয়ে এমএফআইদের ঋণ কার্যক্রমের ব্যয়ভার কমিয়ে আনার চেষ্টাটাই অধিকতর সুফলদায়ক হবে। সার্ভিস চার্জের কিছুটা যেহেতু ট্রেনিং ও অন্যান্য সার্ভিস দেয়ার ব্যয় মেটায়, সেসব পদক্ষেপ আরও যৌক্তিক করা ও আংশিকভাবে মূল্য আদায়সাপেক্ষে সরবরাহ করা যেতে পারে। এসব ট্রেনিং বা অন্যান্য সার্ভিসের চাহিদা আসলে যে কতটা রয়েছে, সে বিষয়ে কিছুটা সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। সেগুলোর মূল্যায়ন করে কিছু কাটছাঁট করা এবং ব্যয় সংকোচন করা যেতে পারে (পৃ-১৩৩)।'

সপ্তম অধ্যায়ে বেকারত্ব ও কর্মসংস্থান নিয়ে একটি সামগ্রিক পর্যালোচনা রয়েছে। এই বিষয়টি র"শিদান ইসলামের নিবিড় গবেষণার অন্ড়র্গত। এখানে বেকারত্বের সংজ্ঞা নিয়ে দেশে যে বড় ধরনের বিভ্রান্ড়ি আছে সে বিষয়ে আলোকপাত করলেও তা যেন কিছুটা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। অর্থাৎ এ বিষয়টি নিয়ে আরও বিস্ড়ারিত আলোচনা বা বিশেণ্ডষণ প্রয়োজন ছিল। যেমন, দেশে বেকারত্বের হার মাত্র সাড়ে চার শতাংশ- এই সরকারি পরিসংখ্যান জনমানসে বিরাট প্রশ্ন তৈরি করেছে। এরকম আরও কিছু বিভ্রান্ড়ি বা অস্পষ্টতা রয়েছে। অবশ্য এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আংশিক বেকারত্ব, ছদ্ম বেকারত্ব, মৌসুমী বেকারত্ব এবং মজুরি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে, তাতে অনেক প্রচলিত ভুল ধারণার অবসান ঘটবে।

অষ্টম অধ্যায়ে এসে দারিদ্র্য নিয়ে কিছু বিশেণ্ডষণের চেষ্টা করেছেন র"শিদান। এখানে দারিদ্র্যের মানচিত্র নিয়ে একটু আলোচনা করার অবকাশ ছিল। আবার ক্রয়ক্ষমতার সমতাভিত্তিক (পিপিপি) এক ডলার পরিমাপের দুর্বলতার দিকটিও আরেকটু বিস্ড়ারিত করা যেতো। যেমন, এক পিপিপি ডলারে আসলে কতো বাংলাদেশি টাকা? ১৭/১৮ টাকা? তাহলে এতো নগণ্য অর্থ কিভাবে দারিদ্র্য পরিমাপের আন্ড়র্জাতিক মানদ" হতে পারে? এসব প্রশ্ন ইদানীং বেশ জোরেশোরে উচ্চারিত হচ্ছে। প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্যের সম্পর্ক খুঁজতে গিয়ে লেখিকা যা পেয়েছেন, তা হলো: 'সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দারিদ্র্য হ্রাস ও জিডিপি প্রবৃদ্ধির যোগসূত্রটি দুর্বল।' আমাদের নীতি-নির্ধারকরা অবশ্য সহজে এই অভিমতের সঙ্গে একমত হতে চাইবেন না!

খুব ছোট হলেও 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য ও তার প্রভাব' শীর্ষক ৯ম অধ্যায়টি তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীতে বিস্ড়ারিত কাজ করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। আর যারা বাংলাদেশের শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন, তারা এখান থেকে কিছু সহায়ক সূত্র পাবেন। শিক্ষা কেন দারিদ্র্য নিরসনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে না?- এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ড় যা পাওয়া গেল, তা হলো: '...শিক্ষার গুণগত মানও অনেকটা দায়ী। শিক্ষার গুণগত মান এবং তা কর্ম সুযোগ সৃষ্টিতে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সেদিকে লক্ষ রাখা জর"রি।...(পৃ-২০৩)।'

পরের অধ্যায় অর্থাৎ ১০ম অধ্যায়টিতে এলাকাভিত্তিক বা আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। এখানে কৃষিজ কর্মকা"ের আলোকে বৈষম্যের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রচেষ্টাটি তাৎপর্যবহ।

একাদশ অধ্যায়ে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ও জনমিতিক উত্তরণ নিয়ে আলোচনা আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি আবারও বাংলাদেশের উন্নয়ন বিতর্কে একটি গুর"ত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। এই বিতর্কে

রসদ জোগানোর উপাদান মিলবে এই অধ্যায় থেকে। পাশাপাশি জনমিতিক লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) নিয়েও যে এখন আলোচনা হচ্ছে, সে নিয়ে কিছু কথাবার্তা থাকলে ভালো হতো।

দ্বাদশ অধ্যায়টিকে কিছুটা স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বলা যেতে পারে। এখানে শিল্পখাতে নারী শ্রমিকের অবস্থান নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা ও বাস্ড়বচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্পখাতে নারী শ্রমিক বললে প্রধানত তৈরি পোশাক খাত সামনে চলে আসে। এই অধ্যায় থেকে জানা যায় যে, অন্যান্য শিল্পখাতেও নারী শ্রমিক সক্রিয়। তবে বিস্ড়ারিত কোনো আলোচনা নেই। বরং একটি ধারণা দেওয়ার প্রয়াস আছে।

৩

সার্বিকভাবে র"শিদান ইসলামের গ্রন্থ 'বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়ন: স্বাধীনতার পর ৪০ বছর' সম্পর্কে অল্পকথায় কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে।

প্রথমত, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও উন্নয়নের ওপর গবেষণানির্ভর ও বিশেণ্ডষণধর্মী গ্রন্থ হিসেবে এটি একটি উলেণ্ডখযোগ্য সংযোজন। প্রচুর তথ্য-উপাত্তের সমাহার ও প্রাসঙ্গিক বিশেণ্ডষণ শুধু গবেষকদের জন্যই নয়, বরং অর্থনীতির ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য অত্যন্ড় সহায়ক হবে। উন্নয়ন নিয়ে যারা কাজ করেন, তাদের কাছেও এই ধরনের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হবে।

দ্বিতীয়ত, বইয়ের ভাষা যথেষ্ট প্রাঞ্জল। বাংলায় অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় ভাষাগত আড়ষ্টতা ও সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়। র"শিদান ইসলাম সেই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছেন। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিভাষাগত জটিলতা রয়েছে। তবে সেটা এই লেখিকার একক সমস্যা নয়।

তৃতীয়ত, বইয়ের একটি সীমাবদ্ধতা হলো সামগ্রীক উন্নয়ন দর্শনের বিষয়টির অনুপস্থিতি। অর্থনীতি পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ এখন মুক্তবাজার নীতির এক চরম রূপ নয়া-উদারতাবাদী (নিও-লিবারেলিজম) ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করতে চাইছে। নয়া-উদারতাবাদের বা উপাদানগুলো একে একে দৃঢ়ভাবে প্রথিত হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক দর্শনের আলোকে যাত্রা শুর" করা বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৪০ বছর পর আজ সেই দর্শন থেকে অনেক অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে তার ছায়া কিছুটা রয়ে গেছে। তাই জনকল্যাণ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে মাঝে-মধ্যে হৈচৈ ওঠে, সরকারগুলোও বিচ্ছিন্ন কিছু জনতুষ্টিমূলক পদক্ষেপ নিয়ে জনমানসে এই ধারণা দিতে চায় যে তারা বাজারে হস্ড়ক্ষেপ করছে।

চতুর্থত, ছোটখাট কিছু মুদ্রণ ত্র"টি আছে ছাপাখানার ভূতের কারণে। এক পর্যায়ে এসে তথ্যসূত্রের ক্রমভঙ্গ হয়ে গেছে।

উপসংহার টানতে চাই এই বলে যে, ৪০ বছরে বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে পড়ার ছবি আঁকতে গিয়ে যে সুবিস্ড়ৃত ক্যানভাস প্রয়োজন, তা এককভাবে কারো পক্ষে ভরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। একেকজন একেকটি অংশ ভরে তুলবেন। আর সেগুলো মিলিয়েই একটি বর্ণিল ক্যানভাস চোখের সামনে ফুটে উঠবে। র"শিদান ইসলাম যথাযথভাবেই একটি অংশ ভরিয়ে তুলেছেন।